বিভূতিভূষণের আরণ্যক : এক নিরন্তরতার কাহিনি

নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্য

'Since then, at an uncertain hour,
That agony returns:
And till my ghastly tale is told,
This heart within me burns.'

The Rhyme of the Ancient Mariner (Samuel Taylor Coleridge)

ইংরেজি সাহিত্যে যাঁদের সামান্য গতায়াত তাঁদের কেউই বোধহয় কোলেরিজের বিখ্যাত কবিতাটি সম্বন্ধে অনবহিত নন। এক একাকী নাবিক একদিন বিবাহ-নিমন্ত্রণের কোনো যাত্রীকে জোর করে তার অনুতাপ-ভরা বিষাদের কাহিনি শোনায়। বিভূতিভূষণের এই আলোচ্য গ্রন্থে কাহিনির কথক সত্যচরণ আমাদের কাছে শোনান তাঁর অনুতাপময় আনন্দ-বিষাদের কাহিনি। কাব্যের নাবিক শ্রোতাকে তার কাহিনি শুনতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু, বিভূতিভূষণের কাহিনিতে জোর করে শোনানোর চেষ্টা নেই। তবু সেই কাব্যকাহিনির শ্রোতার মতোই আমরা বিস্ময়-নিবিষ্ট মন্ত্রমুগ্ধভাবে সত্যচরণের কাহিনিও একটানা শুনে চলি। সে বর্ণনায় কোলেরিজের কথকের মতো নাটকীয়তা নেই, বরং তাতে দ্রষ্টার প্রসারতা আছে, যা কাহিনির নাটকীয় উপাদানগুলোকেও অনুকম্পায় আর্দ্র করে তোলে। বিভূতিভূষণ কোলেরিজ নন, তাঁর রচনাশৈলী একান্তই তাঁর নিজস্ব। সেই নিজস্ব ঢঙে বলা বিভূতিভূষণের এ উপন্যাস একেবারে অননুকরণীয়, ঠিক যেমন তাঁর প্রথম উপন্যাস *পথের পাঁচালী*।

তখন পাথুরেঘাটায় সিদ্ধেশ্বর ঘোষের গৃহে একইসঙ্গে গৃহশিক্ষক ও সেরেস্তার সচিবের কাজ করছেন চিরদিনের ভ্রমণপিপাসু বিভূতিভূষণ। সেরেস্তার টেবিলের ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখেন শরৎ শাস্ত্রীর বই *দক্ষিণাপথ ভ্রমণ*। কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলে চট করে বইটি বার করে নিয়ে 'পাহাড়, জঙ্গল, দূর দেশের বর্ণনা' পড়ে তাঁর 'ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস চেতনাকে চাঙ্গা' করে নেন। এমন সময় বেরিয়ে পড়ার সুযোগ এল। সিদ্ধেশ্বরবাবুদের ভাগলপুর জঙ্গল মহালের জমিদারিতে একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার। বিভূতিভূষণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে যেতে রাজি থাকলে তাঁকে পদটি দেওয়া হবে। মাইনেও বেশি। উনিশ শো চব্বিশ সালের গোড়ায় নতুন কাজ নিয়ে পৌঁছে গেলেন তিনি। শুরু হল অরণ্যবাস। কখনো-সখনো ভাগলপুরে থাকলেও, বেশিরভাগটাই কাটে জঙ্গল মহালে। সেখানে খাটনি প্রচুর। তবু, তারই ফাঁকে সময় করে ঘোড়ার পিঠে বেরিয়ে পড়েন অনাবিল প্রকৃতির অনাবরণ শোভা দেখতে। এখানকার উদার বিস্তৃত অরণ্য-প্রকৃতি তাঁর মনে নিয়ে আসে আর এক পরিবেশের স্মৃতি, যেখানকার গ্রাম্য প্রকৃতির মায়ায় বড়ো হয়ে উঠেছিলেন একদিন। তাঁর বেড়ে ওঠার কাল, তার নানা স্মৃতি, কাছ থেকে দেখা মানুষেরা — এরা সব এই নির্জনতায় ভিড় করে আসে। লিখতে শুরু করলেন *পথের পাঁচালী*; শেষ হল ১৯২৮-শে। সেই

Scanned with CamScanner

বছরই *বিচিত্রা* সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে শুরু করে। বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। আগে গল্প লিখেছেন, ছাপা হয়েছে, প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু এই উপন্যাসেই তাঁর আবির্ভাব। এই বই তাঁকে বাংলাসাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে চির আসন দিল। বাংলার শ্যামল প্রকৃতির পাশাপাশি আছে চেনা মানুষেরা, একে অপরের পরিপূরক হয়ে। নায়ক অপুর বড়ো হয়ে ওঠার কালটিকে যতখানি ঘিরে আছেন তার বাবা হরিহর, হেড মাস্টারমশায়, মা সর্বজয়া, দিদি দুর্গা বা ইন্দির ঠাক্‌রুণেরা, ততখানিই যেন আবেষ্টন করে আছে বাংলার পল্লিগ্রামের শ্যামলিমা। উপন্যাসটি পড়ে গুণী পাঠকেরা চমকে উঠলেন। সজনীকান্ত তা হাতে পেয়েই রাত জেগে শেষ করে ফেললেন। তাঁর রাত-জাগা প্রথম পাঠের উপলব্ধি : 'বেশ বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।' নীরদচন্দ্র চৌধুরী আগেই পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, গোপাল হালদার, সুনীতি চাটুয্যে, মোহিতলাল মজুমদারও অভিভূত। গুণমুগ্ধদের তালিকা আর দীর্ঘায়িত না করে বরং দেখা যাক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কী বলেন। তিনি লিখছেন : পথের পাঁচালী যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা তাকে নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, কোন জিনিস ঝাপসা হয়নি। মনে হয় খুব খাঁটি উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্য সস্তাদরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই — বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। ...

কিন্তু আরণ্যক সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে *পথের পাঁচালী*-র কথা এত কেন? কারণ, বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাসটির মধ্যে তাঁর বলবার মূল কথাটি প্রকাশ পেয়েছিল। সেটিকে খুঁজে না দেখলে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে বোঝা যাবে না। সত্যিকারের লেখক যাঁরা, তাঁদের কতগুলো বলবার মূল কথা থাকে, যা তাঁদের তাড়িত করে নিয়ে চলে, তাঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলোয় সেই কথা জোর করে বলিয়ে নেয়। সে কথা যেমন প্রস্ফুটিত হয়েছে *পথের পাঁচালী*-তে, তেমন *আরণ্যক*-এ, তেমনই তাঁর অসমাপ্ত *ইছামতী* উপন্যাসে। দক্ষিণবঙ্গের প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষকে দেখবার যে ঢং, যে দর্শন *পথের পাঁচালী*-তে, তার ছায়া যেমন *আরণ্যক*-এর অরণ্য-পরিবেশে, তেমনই তার আভাস *ইছামতী*-র চির বহমান উচ্ছলতায়।

তবু *পথের পাঁচালী* বা *ইছামতী*-র তুলনায় *আরণ্যক* আলাদা। প্রথম দুটি উপন্যাসে প্রকৃতি পটভূমিকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও নায়ক সেখানে মানুষেরা, কিন্তু *আরণ্যক*-এর নায়ক যেন অরণ্য-প্রকৃতি। অনেক চরিত্র এসেছে উপন্যাসটিতে। কিন্তু, তারা যেন প্রকৃতিরই অংশ; যেমন অংশ বন শিউলির ফুল, বনহংসলতা, যেমন সরস্বতী কুণ্ডী, যেমন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির অপার্থিব সুন্দর নির্জনতা। অথচ প্রতিটি চরিত্র — ভূমিহীন কৃষক, দরিদ্র উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ, নিম্নবর্ণীয় গাঙ্গোতা, জনজাতির মানুষ, অসহায় নারী, ক্ষমতাবান জোতদার ও মহাজন, কাছারির কর্মচারীরা — সকলেই বড়ো প্রাণবন্ত। তারা কেউ কাগুজে নয় রক্তমাংসে গড়া। এ কথা না হয় এখন থাক এই পর্যন্ত, বিশদ আলোচনায় পরে আবার ফেরা যাবে।

উল্লেখিত তিনটি রচনার আর একটি সামান্য লক্ষণের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। *পথের পাঁচালী*-র নামেই সে লক্ষণের পরিচয় — এক পথিকের পথ চলা। *পথের পাঁচালী*-র নামকরণে নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলেন — ভেবেছিলেন এতে পথের কথা কোথায়, এ তো

Scanned with CamScanner

এক স্থিতিজাড্যময় গ্রামজীবনের কথা। অনুবর্তী উপন্যাস *অপরাজিত* হাতে এলে তাঁর ভুল ভাঙে। পূর্বকথায় যা ছিল প্রচ্ছন্ন, উত্তরকথায় তা প্রকাশিত। *ইছামতী*-ও তেমনই তার নিরন্তর যাত্রাস্রোতোপথে বয়ে নিয়ে চলেছে সাধারণ মানুষের ছোটো সুখ, ছোটো দুঃখের ইতিহাসমালা আর দুই পাড়ের গ্রামজীবনের প্রবহমান সংস্কৃতি।

আরণ্যক-ও তো পথ চলার কথা। কথক সত্যচরণ যেমন নতুন নতুন দেশ দেখবার টানে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি অরণ্যও তো স্থির নেই। যে কয়েক হাজার বিঘের বিস্তৃতি নিয়ে অরণ্য তাকে আহ্বান করে, সেখানকার ভূ-ভাগ ত্রিশবছর আগে নদীগর্ভে চলে গিয়েছিল। ভাঙনের আগে সেখানে ছিল চাষের খেত, গ্রাম, প্রজার বসত। বিশ বছর হল আবার চরা জেগেছে, আর এই ক-বছরে এক অপূর্ব অরণ্যের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সে চলেছে রূপান্তরের দিকে। আবার সেখানে প্রজা বসত হবে, তার অনাবিল রূপ খসে যাবে, জঙ্গল কেটে হবে চাষবাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসত বাড়ি। সত্যচরণও সেখান থেকে চিরতরে চলে যাবে। এভাবেই তো জীবন এগোয় — চরৈবেতি।

আরণ্যক উপন্যাসটির পটভূমি যদিও বিভূতিভূষণের আজমাবাদ-লবটুলিয়া-ফুলকিয়া-নাঢ়া বইহারের জঙ্গল মহালে কাটানোর বছরগুলো, *পথের পাঁচালী* ছাপাবার সূচনায় যার ইতি, লেখক সে বই রচনায় হাত দিলেন অনেক পরে, ১৯৩৭-এ। এ উপন্যাসটিও *পথের পাঁচালী*-র মতোই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিকপত্রে, এক্ষেত্রে *প্রবাসী*-তে। পরে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কাত্যায়ণী বুকস্টল থেকে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আগেই দেখেছি, ওই অরণ্যবাসের সময় এই অপরিচিত জঙ্গল-পাহাড়ের প্রকৃতি তাঁর বাল্যজীবনের, কৈশোরের চেনা প্রকৃতির সাহচর্যে কাটানো দিনগুলির স্মৃতি উসকে দেয়, সেই তাড়নায় *পথের পাঁচালী* রচনার শুরু। তবু সে সময়েই আরণ্যক রচনার কথা তাঁর মনে আসে। সেই সময়কার দিনলিপির অংশ নিয়ে ছাপা বই *স্মৃতির রেখা*-য় তার উল্লেখ আছে। ১৯২৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি দিনলিপিতে লিখছেন :

> এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো — একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, এই নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো — অন্ধকার — এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ ক'রে যে সুঁড়ি পথটা ভিটেটোলার বাগানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়ি পথ এক বাথান থেকে অন্য বাথানে যাচ্ছে — পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা, এ দেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি — এইসব।

আরও পরে, ১৯৩৪ সালের ডায়রিতে লিখেছেন অরণ্য নিয়ে তাঁর উপন্যাস লেখার স্বপ্নের কথা, যে লেখায় থাকবে একাকিত্বের কথা, গাছপালার কথা, যে লেখায় ফুটে উঠবে বড়োলোক জমিদার আর যাদের ঠিকমতো আহার জোটে না সেই দুঃখী ভূমিহীন কৃষকদের জীবনের বৈপরীত্যের কথা। দুধ যেমন আগুনে জ্বাল দিতে দিতে ঘন হয়ে উঠলে তবেই ময়রার ভিয়েনে লাগে, তেমনি স্মৃতি আর অনুভূতিও সময়ের আগুনে ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠলে তা সাহিত্যের ভিয়েনের যোগ্য

Scanned with CamScanner

হয়। তাই বিভূতিভূষণও সাহিত্যে তাঁর অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে সময় নেন *পথের পাঁচালী*-তে, *আরণ্যক*-এ বা *ইছামতী*-তে।

আরণ্যক-এর যে প্রকৃতি, তা সত্যচরণের মতো অধিকাংশ বাঙালিরই অচেনা। অবনীন্দ্রনাথের আর্দ্র ছবিতে বা জীবনানন্দের মায়াময় কবিতায় সেই চেনা রূপ যেমন, এ প্রকৃতি তেমন কোমল, তেমন আর্দ্র, তেমন শ্যামল নয়। দুই রূপের বৈপরীত্যের উল্লেখ উপন্যাসে একাধিকবার করা হয়েছে। সত্যচরণের দেখা এ প্রকৃতি রুক্ষ অথচ সুন্দর, কখনো নিষ্ঠুর, কখনো বিপদ্‌সংকুল, কিন্তু মনোহারী। লেখক বলেছেন যে এ প্রকৃতি তাদের জন্যে, যারা ঘর ছাড়তে ভয় পায় না। এ প্রকৃতি দুর্বল-চিত্তদের জন্য নয়। এ প্রকৃতি কখনো একাকিত্বের, কখনো তা ভয়ের ভাব আনে, কখনো আনে 'একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর' ভাব, কখনো স্বপ্নময়, কখনো বা এক অব্যক্ত বেদনার অনুভূতি। নিস্তব্ধ প্রভাতে, অপরাহ্ণে, সন্ধ্যায়, রাত্রে, মাইলের পর মাইল লোকালয়হীন, পথহীন, জনশূন্য, দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে, শাল-পলাশের জঙ্গলে-পাহাড়ে, গ্রীষ্মের অসহ্য দাবদাহের মধ্যাহ্নে, শীতের মারক রাতে, ফাল্গুন আর বর্ষার পত্রময় গাছে-ঝোপে অসংখ্য বুনো ফুলের ঝলকানিতে, চেনা-অচেনা পাখির পাখসাটে সে রূপের প্রকাশ। বিপদজ্জনক প্রাণীসংকুল গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একলা ঘোড়ায় মাইলের পর মাইল যাত্রার কালে, অথবা মধ্যরাতে জ্যোৎস্নার রূপে তার প্রকাশ। ধু-ধু জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ — 'সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টান সামলানো বড় কঠিন।' এই রূপের আহ্বান মানুষকে 'ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে' করে তোলে, তাকে 'গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না।' প্রকৃতির মধ্যে সত্যচরণ উপলব্ধি করে 'সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী।'

অথচ এই পরিবেশ তাকে শুরুর থেকেই মুগ্ধ করলেও, প্রথমে তা এত অনিবার্য টানে টানে নি। সত্যচরণ কলকাতার ছেলে, সে শহরের হইচই, হুজুগ, আড্ডায়, কলকাতার সংস্কৃতির আকর্ষণে অভ্যস্ত। কাছারির লোকজনও তার চেনা সংস্কৃতির নয়, কাজও শুরুর দিকে এত নয় যে তাতে সর্বদা ব্যাপৃত থাকতে হবে; সময় কাটানোই মুশকিল। বাঙালির চরিত্রগত ঘরকুনো ভাব তাকে পিছনের দিকে টানে, কলকাতার মেসে আধ-পেটা খেয়ে কাটানোও এর থেকে ঢের ভালো বলে মনে হয়। সেই সময়ে ভূয়োদর্শী, বৃদ্ধ মুহুরি গোষ্ঠবাবু, যাঁর বাড়ি বর্ধমান জেলার গ্রামে, তাকে বলেন : 'কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপরে দেখবেন।... জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে।' গোষ্ঠবাবুর কথাই সত্যি হল। আরও একজনের কথাতেও অবাক হল সে — বৃদ্ধ জয়পাল কুমার। জগতে তার কেউ নেই, সে সারাদিন কেবল কর্মহীন বসে থাকে। অথচ তার কোনো একাকিত্ব নেই, তার খারাপ লাগে না, এভাবে বেঁচে থাকতে তার বেশ লাগে। সত্যচরণ তাকে ঠিক বুঝতে না পারলেও কোথাও তার সঙ্গে নিজের একটা মিল খুঁজে পায়। এই অরণ্য পরিবেশের মায়ায়, তার রূপের প্রভাবে সেও কি জয়পালের মতো এক নিস্পৃহ দ্রষ্টা হয়ে উঠছে না? এই যে সভ্যজগতের আকর্ষণ ক্রমশ চলে যাচ্ছে তার। কখনো শহরে গেলে মন হাঁপিয়ে ওঠে, আবার জঙ্গলের চৌহদ্দিতে ঢুকলে মনটা শান্ত, অভিভূত হয়।

শুধুই কি প্রকৃতি, শুধুই গাছপালা, জঙ্গল-পাহাড়, ফল-ফুল, পাখি-জানোয়ার? মানুষেরা

Scanned with CamScanner

নেই সেই পরিসরে? আছে বৈকি। কাছারির কর্মচারী গোষ্ঠবাবু, তেওয়ারি, সিপাহি মুনেশ্বর, আস্‌রফি টিণ্ডেল, ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে, টোলের শিক্ষক মটুকনাথ পাঁড়ে, মুসম্মত কুন্তা, ভানুমতী, মঞ্চি, সদ্যমৃত ডাক্তার রাখালবাবুর বিধবা পত্নী, নাটুয়া ধাতুরিয়া, কবি ভেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ ও কবিপত্নী, ভানুমতীর বাবা সাঁওতাল রাজা অতিবৃদ্ধ দোবরু পান্না, তুলসীর স্বামী নক্‌ছেদি, বন্ধু-কর্মচারী যুগলপ্রসাদ, মহাজন ধাওতাল সাহু, রাসবিহারী সিং রাজপুত, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা — আরও কত। কিন্তু যেমন কাশবনের ঝাড়, যেমন দুধলি ফুলের শোভা, যেমন কুণ্ডীর স্নিগ্ধ জল, যেমন শাল-পলাশের বন, যেমন দিগ্বলয়হীন শৈলশ্রেণি, তেমনই এরা, একটা বিশাল নকশায় নানা রঙের বুটির কাজ। এত মানুষ, এত বৈচিত্র্যময় চরিত্র, তবু তারা যেন কোনো সোনারের গাঁথা মণিমালার এক একটি মণি — মহাকালের গাঁথা 'সূত্রে মণিগণা ইব'। চরিত্রগুলি ঘটনার আবর্তের মধ্যে দিয়ে হয়তো যায়, কিন্তু তা তাদের চারিত্রিক সম্প্রসারণ ঘটায় না। কয়েকজন, যেমন কুন্তা, মঞ্চি, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, রাজা দোবরু পান্না বা রাজু পাঁড়ে যেন ছোটোগল্পের উপজীব্য। কিন্তু উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলোর যেমনটা হওয়া স্বাভাবিক, তেমন প্রসার বা পুনর্গঠন তাদের চরিত্রে নেই। গোটা উপন্যাসে একমাত্র ঔপন্যাসিক চরিত্র লক্ষণ বোধহয় কেবল অরণ্য-প্রকৃতির, আর কারো নয়। তাই, বলা যেতে পারে অরণ্য প্রকৃতিই এ উপন্যাসের একমাত্র মুখ্য চরিত্র, মানুষেরা সকলেই পার্শ্বচরিত্র। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ তাই ব্যতিক্রমী গল্পকার। বাংলা সাহিত্যের না বিশ্বসাহিত্যের নানা কাহিনিতে প্রকৃতি এলেও সে মানবচরিত্রগুলোর সহচর মাত্র। কিন্তু *আরণ্যক*-এ প্রকৃতিই মূল। গাছপালা, পাহাড়, মাটি, জল, আকাশ, আলো-ছায়া এদের মানুষের মতো ভাষা নেই, এরা নৈঃশব্দ্যের জাল ছড়িয়ে কথা বলে। লেখক সে ভাষা শুনেছেন। তাই বলেন — 'চাঁদের কলা যখন বাড়ে কমে, তখন জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম শব্দ হয়।'

তবু, মানব কুশীলবেরা তাদের যে ধাঁচা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তা এত অভিনব অথচ এত বাস্তব, যে আমরা তাদের ভুলতে পারি না। কাহিনির কথক সত্যচরণও ওই এলাকা ছেড়ে আসার পনেরো-ষোলো বছর পরে কলকাতার ভিন্ন পরিবেশের অপরাহ্ণে যখন সে দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছিল তখন সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত সেই মানুষদের কথাও তার মনে পড়ে গেল — 'শুধু বনপ্রান্তর নয়,কত ধরণের মানুষ দেখিয়াছিলাম।' প্রথমেই তার মনে পড়ে কুন্তার কথা, নাটুয়া ধাতুরিয়া, সরল মহাজন ধাওতাল সাহু আর স্বল্পশিক্ষিত দার্শনিক রাজু পাঁড়ের কথা। রাসবিহারী সিং রাজপুত বা নন্দলাল ওঝার মতো দুর্দান্ত মহাজনেরাও সেখানে ছিল — কিন্তু তারা সত্যচরণকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাদের সম্পদে কোনো শ্রী নেই, তাদের 'বর্বর প্রাচুর্য', তাদের জীবনযাত্রায় কোনো পরিশীলন নেই, তাদের বিবেক নেই। ধাওতাল সাহু অবশ্য বড়োলোক হলেও অন্যরকম। তাই তার সম্পত্তি বাড়ে না, বরং কমে। টাকা ধার নিয়ে কেউ শোধ না করলে সে অন্য মহাজনদের মতো গলায় পা দিয়ে আদায় করতে পারে না। শুধু তাই নয়, সে কোনো খাতককে কড়া কথা বলতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে এর সুযোগ নেয়। কত দলিল তামাদি হয়ে যায়, ধাওতাল আইন-আদালতেও প্রতিকার চায় না। এত টাকার মালিক হলেও সে সাধারণ ময়লা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়, সাদামাটা বাড়িতে চাকর-বাকর নেই, পথে ঝোপের

Scanned with CamScanner

ধারে বসে পরনের কাপড়ের খুঁটে কলাইয়ের ছাতু মেখে অনায়াসে খায়। একবার সত্যচরণের প্রয়োজনে সে মুখের কথায় কোনো লেখাপড়া ছাড়াই, সে যুগে তাকে সাড়ে তিনহাজার টাকা অনায়াসে ধার দেয়। যাতে সত্যচরণ মনে না করে সে টাকার তাগাদা করছে, তাই টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে কাছারি এলাকা ইসমাইলপুরের ধারে-কাছে আসেনি। সে নিজে ধনী হয়েও তাই ওই বড়োলোকদের প্রতিনিধি যতটা না, তার চেয়ে বেশি সেই দরিদ্র, অসহায় মানুষগুলোর, যাদের দু-বেলা আহারের সংস্থান নেই, নিরাপত্তা নেই, তবু যারা জীবনযাপনে নীতিতে বিশ্বাসী; যারা ধর্মভীরু, অন্যকে ফাঁকি দেওয়া যাদের স্বভাবে নেই, মরসুম শেষে ফসল কেটে দু-পয়সা পেলে যারা একটু বে-হিসেবি কেনাকাটা করে বটে, কিন্তু মদ খেয়ে ফুর্তি করবার কথা ভাবতে পারে না। এদেরই তো সত্যচরণ ভালোবেসে ফেলেছিল।

দারিদ্র্যের এই ভয়াবহ রূপ সত্যচরণ বাংলায় থাকতে কল্পনায় আনতে পারত না। সে প্রথমেই অবাক হল একটা সামান্য কড়াই কেনবার জন্য কাছারির সিপাহি মুনেশ্বরের আকুতি আর তা পাওয়ায় তার খুশি দেখে। ম্যানেজারবাবু আসছেন শুনে মানুষের ভিড় দেখে কৌতূহলী হলে সে জানতে পারল যে তারা ভাতের আশায় অনিমন্ত্রিত এসেছে। আগন্তুকদের মধ্যে একজন তিওয়ারি। তাকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল এ দেশে গরিব মানুষ রোজ ভাত খেতে পায় না। তিওয়ারি নিজে ভাত খেল তিন মাস পরে। নউগচ্ছিয়ার মাড়োয়ারিরা রোজ ভাত খায়, আর খায় রাসবিহারী সিং রাজপুতের মতো লোকেরা। পরে সে জেনেছিল এদের দৈনন্দিন আহার হল চীনা ঘাসের দানা, অথবা খাটো বা মকাই সিদ্ধ, কিংবা খেড়ির দানা সিদ্ধ, সঙ্গে কখনো বাথুয়া শাক সিদ্ধ, ধুঁধুল সিদ্ধ আর ফাল্গুনে নুন দিয়ে গুড়মি ফল। ওই ভয়ানক শীতে কারও গাত্রবস্ত্র নেই, আগুন পুহিয়ে রাত কাটায়। এই দরিদ্র সমাজের অসহায় অনুদ্বেলতার কথা বারবার এসেছে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, এমনকী অন্য রচনায় স্বয়ং বিভূতিভূষণেরই হাত ধরে; কেবল, সেখানে তাদের পটভূমিকা ছিল বাংলার মাটি আর এখানে বিহার প্রদেশের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুপঠিত 'এবার ফিরাও মোরে' নামের কবিতায় দারিদ্র্যের এই অসহায় শান্ত গ্রহণীয়তার কথাই ফুটিয়েছেন কয়েকটি পঙ্ক্তিতে :

> ... স্কন্ধে যত চাপে ভার
> বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার —
> তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
> নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
> মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান
> শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
> রেখে দেয় বাঁচাইয়া। ...

আর রাসবিহারী, নন্দলাল বা বন্দোবস্তে হাজার বিঘে জমি পাওয়া ছোট্টু সিং যখন তাদের উপর অত্যাচার করে, তাদের বেঁচে থাকবার সামান্য সম্বলটুকুও কেড়ে নিতে চায় :

Scanned with CamScanner

... সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। ...

প্রথম পরিচয়েই সত্যচরণের এদের ভালো লেগে গেল, আর সে ভালো লাগা থেকে গেল শেষ পর্যন্ত — 'কেন জানিনা, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা — এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষ মানুষ করিয়া গড়িয়াছে।' তার ভালো লাগবার কারণ আরও স্পষ্ট করে বলছে সত্যচরণ — 'দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ... ন'মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে — তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।' দরিদ্র, গ্রাম্য, সরল এই মানুষগুলোর আনন্দ গ্রহণ করবার এই অনায়াস শক্তিই বোধহয় শহুরে, আড্ডাবাজ কলকাতার বাঙালি সত্যচরণের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল, যা তাকে এই ক-বছরের নির্জনবাসের জ্বালানি জুগিয়েছিল। এই মানুষগুলো যেমন করে জীবনকে ভালোবাসে, সে তেমনি করেই এই অরণ্যভূমিকে এই মানুষগুলো সমেত ভালোবেসে ফেলেছিল।

আমরা আগেই দেখেছি, উপন্যাসের মূল মানব-চরিত্রগুলো যেন ছোটোগল্পের। রাজু পাঁড়ে, মুসম্মত কুন্তা, মঞ্চি ও তার পরিবার, ডাক্তার রাখালবাবুর বিধবা পত্নী, নাটুয়া ধাতুরিয়া, কবি ভেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ ও কবিপত্নী, রাজকুমারী ভানুমতী ও তার বাবা সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না — এরা সকলেই ছোটোগল্পের অবিস্মরণীয় চরিত্র হতে পারত। সকলকে এই প্রবন্ধের পরিসরে আনা যাবে না, কয়েকজনের আলোচনা চলতে পারে। কুন্তার কথাই ধরা যাক। তার চরিত্রে নানা শেডের তুলির টান; সে জন্মেছে লখনৌয়ের বাইজির ঘরে, বিয়ে হল প্রবল প্রতাপ রাজপুত মহাজন দেবী সিংয়ের সঙ্গে। উঁচু জাতের, বড়োলোক, ক্ষমতাবান স্বামীর সুখ তার বেশিদিন সইল না। সম্পত্তি নিঃশেষিত করে ছ-বছরেই দেবী সিং রোগে মারা গেল। নিঃসহায়, অর্থ-সম্মানচ্যুত কুন্তা একা হাতে ছেলেদের মানুষ করে। তাকে প্রায়ই অর্ধাহার-অনাহারে থাকতে হয়, তবু সে তার মতো করে পরিবারের সম্মান রাখার চেষ্টা করে। ছেলেদের খাবার জোগাতে বুনো কুল চুরি করতে গিয়ে অপমানিত কুন্তাকে দেখে ফেলার পর সে লজ্জায় আর সত্যচরণের কাছারিতে আসে না, যদিও এতদিন প্রতি রাতে সত্যচরণের পাতের অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট খেয়ে চলছিল তার পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তি। সত্যচরণ রাজপুরুষ, তাই তার উচ্ছিষ্টে অসম্মান নেই। অথচ স্বাচ্ছন্দের লোভ দেখানো রাসবিহারী সিংয়ের কুপ্রস্তাব সে হেলায় ত্যাগ করে। আবার, নীচু জাতের গাঙ্গোতা বৃদ্ধ অসুস্থ গিরধরলালকে সেবা করবার অনুরোধে সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়, জাতের গর্ব তাতে বাধা হয় না। এর বিনিময়ে পারিশ্রমিকের যে প্রস্তাব সত্যচরণ দেয়, তাও হতদরিদ্র কুন্তা ফিরিয়ে দেয়। গিরধরলাল তার সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner

আর একজন হল রাজু পাঁড়ে। সে দরিদ্র, স্বল্পশিক্ষিত, কিন্তু ভাবুক। সত্যচরণ তাকে যে দু-বিঘে জমি দিয়েছিল তা দেড়বছরেও সে সত্যিকারের চাষ-আবাদের উপযোগী করতে পারে না। ততদিন ওই মাঠে ফলানো চীনে ঘাসের দানা খেয়ে অক্লেশে তার দিন কাটে। কিন্তু, সারাদিনে তার সময় বড়ো কম। সে বনফুলে সাজিয়ে দেবতার প্রতিমায় পূজা করে, পুঁথি পড়ে। শুধু তাই নয়, বন-জঙ্গল তার ভালো লাগে। সেখানে কত কাল থেকে ফুল ফুটছে, পাখি ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে প্রকৃতির দেবতা সেখানে পৃথিবীর মাটিতে পা দেন। তারা যেন রাজুর কানে কানে কত কথা বলেন। তাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন দূরে চলে যায়। সত্যচরণ বোঝে, রাজু অলস নয়, সে একাধারে কবি ও দার্শনিক। আবার শুয়োরমারি বস্তিতে যখন কলেরার আক্রমণ হয়, তখন সে তার কর্মহীনতা ছেড়ে দিয়ে, নিজের জীবন বিপন্ন করে, রোগীর সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিনিময়ে মোট সাড়ে তিন আনা ভিজিট পেয়েই সে সন্তুষ্ট। সত্যচরণ তার সেবায় যোগ দেয়।

এমনি একেবারেই নিজস্ব *আরণ্যক*-এর চরিত্রগুলো। বাল্যকালে যখন বইটা প্রথম পড়ি, আমার মনে হয়েছিল এই চরিত্রদের নিয়ে বিভূতিভূষণ ছোটোগল্প লিখলেন না কেন। সসংকোচে প্রকাশ করি বালকসুলভ দুঃসাহসে এদের নিয়ে এক-একটা ছোটোগল্প মক্শো করি, যাদের সমাপ্তি হবে বিভূতিভূষণীয় নিস্তরঙ্গতায় নয়, রবীন্দ্র-গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্বের নাটকীয়তায়। অরবিন্দ একবার তাঁর এক অনুগামীকে বলেছিলেন : কীটসের কাব্য তাঁর থেকে ভালো করে লেখার ব্যর্থ চেষ্টা কোরো না, বরং নিজের মতো লেখ। সেই ঋষিবাক্য শিরোধার্য করে সে যাত্রা লোক-হাসানোর বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে ছিলাম। *আরণ্যক*-এর গঠনশৈলী এতই স্বাভাবিকতায় সরল যে তা বালকদেরও অসমসাহসী করে তোলে। সৈয়দ মুজতবা আলী একবার রাশিয়ান লেখক তুর্গেনিভের আলোচনায় বলেছিলেন তাঁর লেখা জলের মতোই বহমান। বিভূতিভূষণের বেলায়ও এ কথা সর্বাংশে সত্য। *আরণ্যক* স্বচ্ছতোয়া নদীর মতো বয়ে চলে, পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না।

যুগলপ্রসাদে যেন সত্যচরণেরই প্রসারণ। সত্যচরণ তাকে সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে প্রথম দেখে। কাঁচা-পাকা চুলের একজন লোক মাটিতে বীজ পুঁতছে। সঙ্গের চটের থলি থেকে ছোটো একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাচ্ছে, পাশে একটা শাবল পড়ে, ইতস্তত কতগুলো কাগজের মোড়ক ছড়ানো। ভালো করে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে, সত্যচরণ বোঝে যে সে এই জঙ্গলে পুঁতে দিচ্ছে পূর্ণিয়ার এক সাহেবের বাগান থেকে জোগাড় করে আনা, রাঙা ফুল দেয় এমন একটা বিলিতি লতার বীজ; দু-বছর বাদে ফুল ধরলে বেশ দেখাবে, তাই। সৌন্দর্যপিপাসু যুগলপ্রসাদ সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে একটা বিস্তৃত বনভূমিকে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করছে নিজের সময় ও অর্থ ব্যয় করে—এমন জমিতে যেখানে তার ভূ-স্বত্ব কিছু নেই। সত্যচরণ ভাবে—'কী অদ্ভুত লোকটা।' তাকে সত্যচরণের ভালো লেগে গেল। অভাবী লোকটার কাছারিতে দশ টাকা মাইনের মুহুরির চাকরি মিলল। দুজনে মিলে সরস্বতী কুণ্ডীতে লাগাল কত রকমের গাছ। তার মধ্যে যেমন ছিল বন্য দুধিয়া ও বয়ড়া, দিশি হলদে ধুতুরা ও পদ্ম, তেমনই ছিল বিদেশি এরিস্টলোকিয়া বা হংস লতা, হোয়াইট বিম, রেড ক্যাম্পিয়ন, স্টিচওয়ার্ট, ফক্সগ্লাভ, উড অ্যানিমোন, ডগ রোজ বা হানি স্যাক্ল। যখন তারা বুঝল সরস্বতী কুণ্ডীর সংলগ্ন জমিও আর রাখা যাবে না, তখন দুজনে ঠিক

Scanned with CamScanner

করল মহালিখারূপের পাহাড়ে নানা গাছ লাগাবে। ওখানকার মাটি তো জমিদারির আওতাভুক্ত নয়, সে অরণ্য তাই থেকে যাবে। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে আজ এতদিন পরে সেই মহালিখারূপের কেমন চেহারা।

সত্যচরণ এই পরিবেশের সবটা চায়। এইসব মায়াময় এলাকায় রাত্রে জিন-পরিরা, বনদেবীরা নেমে আসেন, জ্যোৎস্নায় তাঁরা খেলা করেন, বনের দেবতা টাঁড়বারো মহিষদের রক্ষা করেন মানুষের লোভের হাত থেকে। সত্যচরণের বিদ্বান, বিজ্ঞান-ইতিহাস-সমাজ সচেতন মন এই অবাস্তব জগতে বিচরণ করতে বাধা পায় না; যেমন এ প্রকৃতিকে, যেমন এই অরণ্যচারী মানুষদের, তেমনি তাদের কল্পলোকের জগতকেও সে উপভোগ করে।

আরণ্যক-এর আলোচনা করতে গেলে অরণ্য-প্রকৃতির কথা যেমন, তেমনই দোবরু পান্নার কথা না বললে নয়। বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধ সাঁওতাল রাজার রাজত্ব বহুদিন হল গিয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও কিম্ভূত মুখ-ওয়ালা নিশানদিহি খাম্বা সেই পুরোনো স্মৃতি বহন করছে। প্রবল প্রতাপ জমিদারের ম্যানেজারবাবু এহেন বাতুল রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে কর্মচারী বুদ্ধু সিং তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সত্যচরণ জঙ্গল-পাহাড় ভেঙে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় সঙ্গে ফলমূল ও গোটা দুয়েক মুরগি 'নজর' নিয়ে যায়। রাজধানী বলতে জঙ্গলের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ ঘরের পরিচ্ছন্ন গ্রাম; মাটির ঘর, খাপরার চাল, মাটির দেওয়ালে আলপনা আঁকা। রাজার বাড়িও একই রকম, কেবল সামনের পাহাড় থেকে আনা পাথরের টুকরো দিয়ে সেটার চারদিকে পাঁচিল তোলা। রাজাকে দেখতে বৃদ্ধ সাঁওতাল কুলির মতো, জীবিকা গোচারণ, আর রাজবংশের প্রাচীন প্রাসাদ আসলে পাহাড়ের উপর শিয়ালের গর্তের মুখের মতো প্রবেশ-দ্বার দিয়ে ঢোকা প্রশস্ত গুহা-কন্দরদ্বয়। সে কন্দরে বাদুড় ছাড়াও ভাম, শিয়াল, বনবিড়ালের বাস। রাজার নাতির মেয়ে তরুণী রাজদুহিতা ভানুমতী সপ্রতিভ, কিন্তু স্বল্পবাস পরিহিতা; তার গলায় পুঁতির আর কড়ির মালা।

সত্যচরণ কিন্তু মুগ্ধ হল রাজকীয় সমাধিক্ষেত্র দেখে। সে বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র আচ্ছাদন করে আছে বহুপ্রাচীন এক ঝুরি-ছড়ানো বটগাছ। মাটিতে প্রোথিত মাইল ফলকের মতো এক একটি প্রস্তর এক এক রাজার সমাধি নির্দেশ করছে। বহুদিনের কোনো কোনো ফলককে বটের ঝুরি আঁকড়ে ধরে আছে। সমাধিক্ষেত্রের প্রাচীনত্ব দেখে, তার নিস্তব্ধ, অনাড়ম্বর, গাম্ভীর্য দেখে সত্যচরণ মুগ্ধ হল। পথে পড়ল অরণ্যদেবতা মহিষদের রক্ষক টাঁড়বারোর প্রতিভূ সিঁদুর-লেপা কালো পাথর। সেদিন মধ্যাহ্নে আহারের রাজার সাদা-সাপটা অনুরোধ সে রাজাদেশ বলেই গ্রহণ করেছিল। ঝুলন-উৎসবের রাত্রে তরুণ-তরুণীদের প্রাচীন অরণ্যনৃত্যে তার চোখের সামনে যেন কত যুগ ধরে চলে আসা ঝুলন-উৎসবের ধারা প্রকাশিত হল।

তার মনে হয়েছিল যে এই রাজবংশের ধারা প্রস্তরযুগের কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রবহমান। এরা আর্যদের সঙ্গে লড়াই করেছে, মোঘল বাদশাদের সঙ্গে লড়াই করেছে, ১৮৬২-তে সাঁওতাল বিদ্রোহে প্রবল-পরাক্রান্ত ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছে। দোবরু পান্না নিজেও সাঁওতাল বিদ্রোহের বিজিত যোদ্ধা। ভারতবর্ষের রাজবৃত্তের, তার সংস্কৃতির মূল ধারার যে পতাকা আর্য, তুর্ক-আফগান

Scanned with CamScanner

বা ইংরেজরা বহন করে চলেছিল, তার বাইরেও তারই পাশাপাশি অরণ্যকেন্দ্রিক জনজাতির সমাজের যে উপধারা তার প্রতীক যেন এই দোবরু পান্না আর তাঁর রাজ্যহীন রাজবংশ। শহুরে শিক্ষিত মানুষের কাছে যেমন অরণ্য-প্রকৃতির দাম নেই, তেমনই নেই এই 'জংলি' সংস্কৃতির। অনুভূতিপ্রবণ, ইতিহাস সচেতন সত্যচরণ এই ধারাটিকে চিনে নিতে পারে। রাজার মৃত্যুর সংবাদে সে পাহাড় ঠেলে যায় সমাধিক্ষেত্রে রাজার সমাধিতে, ভানুমতীর সঙ্গে বন-শিউলির ফুল সমাধিতে ছড়িয়ে দিয়ে সেই রাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শ্রদ্ধা জানায় সেই ক্ষীণস্রোতা চিরবহমান সমাজকে, যা হয়তো তার লবটুলিয়ার কুঞ্জকাননের মতোই অচিরে হারিয়ে যাবে।

ঠিক সেই সময় ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া একদল সিল্লি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল বটগাছটার মগডাল হইতে — যেন ভানুমতী ও রাজা দোবরুর সমস্ত অবহেলিত, অত্যাচারিত প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন — সাধু! সাধু! কারণ আর্য-জাতির বংশধরের এই বোধহয় প্রথম সম্মান অনার্য রাজ-সমাধির উদ্দেশে।

রাজদুলালী ভানুমতী। সে কৃষ্ণা, সুন্দরী, উদ্ভিন্নযৌবনা, নিরক্ষরা, সরলা, বনবালা। তবু সে রাজকুমারী। নিজের বংশ নিয়ে তার গর্ব আছে। সে সত্যচরণকে জানায় যে, একসময় এই সমস্ত দেশ তাদের রাজধানী ছিল, সারা পৃথিবীটা। পৃথিবীর কতটুকু চেনে ভানুমতী। সে গয়া, মুঙ্গের, পাটনা আর কলকাতা শহরের নাম শুনেছে, জানে গয়া জেলায় বাস করে। কিন্তু ভারতবর্ষের নাম শোনেনি। কোথাও যায়নি কখনো চক্‌মকিটোলা ছেড়ে। তার মতোই অনেকের দেশ সম্বন্ধে এমনি ধারণা।

সত্যচরণের মতো শহুরে, পাশ্চাত্য-শিক্ষিত লোকও ভানুমতীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। একবার ভাবে এই বনাঞ্চলে ভানুমতীকে বিয়ে করে যদি থাকতে পারত, বেশ হত। তার এই ভাবনা ক্ষণিকের, তা ভানুমতীর সখের আয়নাটির মতোই ভঙ্গুর। এ অনুষঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোঁতা আবিষ্কার' গল্পের নায়কের কথা। শেষবারের মতো সত্যচরণ চক্‌মকিটোলা ছেড়ে চলে আসে।

সত্যচরণ জানত তার সাধের পুষ্পকানন স্থায়ী নয়। জমি তাকে বন্দোবস্ত করতেই হবে। যারা কিনবে তারা তো যুগলপ্রসাদের মতো কুঞ্জকাননের প্রেমিক নয়, সব কেটে সাফ করে তারা সেখানে ফসল রোপন করবে, ঘরবাড়ি বানাবে। এই অনাবিল সৌন্দর্য চলে গিয়ে তার জায়গা নেবে কুশ্রী, নোংরা, ঘিঞ্জি বসতি। তাই সত্যচরণের মনে হয়, 'কিসের বদলে কী পাওয়া যাইবে।'

কিন্তু, জঙ্গল মহালের জঙ্গল ধ্বংস হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, একদিকে জমিদারদের আর্থিক প্রয়োজন, অন্যদিকে এই দরিদ্রতমদের জীবনধারণের উপায়। এই জঙ্গল সাফ করে, তাতে গোচারণ করে আর ফসল ফলিয়ে এদের বেঁচে থাকার চেষ্টা। যদিও তাতে তাদের জীবনযাত্রার মান অতি সামান্যই বাড়ে, তবু তা যেন তাদের মৃত্যুর দিক থেকে জীবনের দিকে কিছুটা টেনে তোলে। তাই এই অপরূপ অরণ্য-প্রকৃতির ধ্বংস সত্যচরণকে হৃদয়কে বিষণ্ণ করলেও বুদ্ধি দিয়ে সে এর অমোঘতা অনুভব করতে পারে।

কোলেরিজের কাব্যের নাবিক যেমন তার কথা শেষ করে এক অনিঃশেষ বিষণ্ণতা নিয়ে,

Scanned with CamScanner

সত্যচরণও তাই। নাবিক যে কাহিনি বলে তা তার কাছে আনন্দের স্মৃতি আনে না, দুঃখ এবং অপরাধবোধ নিয়ে আসে। সত্যচরণও তার কথার শুরুতে বলে :

কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সে জন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনির অবতারণা।

তার কথা শেষ করে সে ক্ষমা চেয়ে নেয়!

হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়! ...

সত্যচরণ ভালোবেসেছিল অরণ্য প্রকৃতিকে আর সেই প্রকৃতির কোলে থাকা মানুষদের। কোলেরিজের নাবিক তার কথা শেষে এই ভালোবাসারই জয়গান করে :

He prayeth best, who loveth best
All things both great and small;

সত্যচরণের এই দুঃখ, তার এই বিষণ্ণতা কি আমরাও কিছুটা বুঝি না, বিহার-পূর্ণিয়ার অবাধ প্রকৃতির সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, যাদের জন্ম-কর্ম শহর, শহরতলি বা আধা-শহরের সংকীর্ণ গণ্ডিতে ঘোরাফেরা করে।

কাব্যে সেই নাবিক কাহিনির শ্রোতার অনুভূতি কবি বলেছেন :

He went like one that hath been stunned,
And is of sense forlorn :
A sadder and a wiser man,
He rose the morrow morn.

শহুরে কলুষ আমাদের বোধের উপরে ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে। বাজারি সুগন্ধের আগ্রাসন আমাদের ইন্দ্রিয়কে এত ভোঁতা করে দিয়েছে, যে আমরা বুনো ফুল, মথিত ঘাস আর মাটির ঘ্রাণের স্বাদ পাই না, আমরা গাছকে নিছক গাছ বলেই চিনি, আম-জাম-কাঁঠালের চেনা গণ্ডির বাইরে তাদের আলাদা করে চিনে নিতে পারি না, ঘেমো গায়ের ময়লা পোশাকের মেঠো মানুষের সঙ্গে আমরা সত্যচরণের মতো পাশাপাশি উবু হয়ে বসে কখনো আগুন পোহাইনি। তবুও কি আমরা প্রকৃতি ধ্বংসের ভয়াবহতা বুঝি না। বুদ্ধি দিয়ে বোঝার কথা বলছি না, অন্তরের গভীর থেকে যে বোধ উঠে আসে তার কথা বলছি। এই যে সড়ক পথে দু-ধারে গরমে ছায়া দেওয়া, বৃষ্টিতে আড়াল দেওয়া, কত পাখি-পতঙ্গের আশ্রয় দেড়শো-দুশো বছরের বনস্পতি হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, নিলাম হয়ে যাচ্ছে, এই যে সেদিনও বর্ষার প্লাবিত জল ধরে রাখা, তে-চোখো মাছের, শ্যাওলার আর জলের পোকাদের নীড়, পাড়ার মাঠের ডোবাগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, নয়ানজুলিগুলোতে ফুরিয়ে যাচ্ছে ফড়িঙের আনাগোনা, স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে বর্ষায় ব্যাঙের ডাক আর সন্ধেয় ঝিঁঝি পোকার ঝিঁ ঝিঁ; এখন যে অনেক শহরাঞ্চলে কাক আর শালিক ছাড়া পাখি নেই—

Scanned with CamScanner

ছড়ার লেজঝোলা বা কাহিনির বউ-কথা-কও আর শিশুদের মনে কোনো ব্যঞ্জনা আনে না; গ্রামের ছেলেমেয়েরা আর সন্ধেয় শেয়ালের ডাক শুনতে পায় না, চেনে না আতা, শ্যাওড়া, আঁশফল, বুনো কুল বা গাবের গাছ, মাদার গাছ আর কাঁটায় ফুলে ফুটে উঠে বরযাত্রীদের ডেকে নেয় না — এসব কি আমাদেরও একটু হলেও বিষণ্ণ করে না, মনের ভিতরে একটুও শিরশিরানি ধরায় না, একটুও প্রেরণা দেয় না এদের ফিরিয়ে আনার কথা ভাবতে। নাবিক-কাহিনির শ্রোতার মতো আরণ্যকের কাহিনি আমাদের মনকে গ্লানিতে অবশ যদি না-ও করে, সত্যচরণের আর তার স্রষ্টা বিভূতিভূষণের মনের বিষাদ কি আমাদের ছুঁয়ে যায় না। যদি এর জবাব না-তেই হয়, তবে আর এ আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই, এখানেই ইতি টানা ভালো।

Scanned with CamScanner